মহাবিশ্বের শেষবিন্দু ও আমি

আধ্যাত্মিক থ্রিলার গল্প

মোঃ নাজমুল হক

"মহাবিশ্বের শেষ বিন্দু ও আমি"

আধ্যাত্মিক থ্রিলার গল্প

(৫ পর্বে সমাপ্ত)

মোঃ নাজমুল হক

সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি,

সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ

Email : litonkona@gmajl.com

(২০/১১/২০২৫)

পর্ব : ১

....

রাতের আকাশটি অদ্ভুদ শান্ত। নক্ষত্রগুলো যেন নদীর জলে ভাসা ছোট ছোট প্রদীপ—প্রতিটি আলোর বিন্দুই আলাদা, কিন্তু একসাথে মিলেমিশে এক অসীম জ্যোতির সমুদ্র তৈরি করছে। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে আছি, মাথার ওপর এই অনন্ত নীল আকাশ, আমার মনে হচ্ছে যেন পুরো আকাশ আমার বুকের ভেতরের অদৃশ্য চিৎকারটাকেই

INTERNET ARCHIVE

প্রতিধ্বনিত করে চলেছে । বাতাস মৃদু , হালকা, কিন্তু যেন কি একটা অজানা ভারে ভারাক্রান্ত , যা আমার কৌতূহল, আমার তৃষ্ণা, আমার অস্থিরতা সবকিছুকে সঙ্গে বহন করে চলেছে। এরকম এক অপার্থিব পরিবেশ আর চারপাশের গাঢ় নীরবতায় একটা অমীমাংসিত প্রশ্ন আমার আত্নার গহীনে বারবার ফিরে ফিরে আসছে —এটা প্রতিদিনই আমার চেতনার গভীরে ঢুকে ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করে চলেছে । আমি নির্বিকার বসে আছি, কিন্তু মনের মধ্যে এক অদৃশ্য ঝড় চলছে।

আকাশের অনন্ত গভীরতায় হারিয়ে আমি ভাবছি - এই মহাবিশ্বের কি শেষ কোন বিন্দু আছে? আমি যদি মনে মনে একটি সরলরেখা ধরে অনন্তকাল ধরে হাটতে থাকি, তাহলে কি কখনও এর শেষ সীমানায় পৌঁছাতে পারব ? যদি ধরে নেই পারব তাহলে ঐ অন্তিমবিন্দু কে ছাড়িয়ে তারপর কি থাকবে ? যাকে কোন দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ দিয়ে মাপা

INTERNET ARCHIVE

যায়না , তার বাস্তব অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব ? অথচ এই অসীম বিশ্ব কিভাবে অনাদিকাল ধরে বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের সবাইকে ধারণ করে আছে ? যতবারই এই চিন্তার বালুচরে পা ফেলি , ততবারই এক উত্তরহীন চোরাবালির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি । এই প্রশ্নগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে শব্দে প্রকাশ করা সহজ, কিন্তু এগুলো যে অনুভূতি তৈরি করে—তা বোঝানো কঠিন। যেন মাথার ভেতর কেউ ধারালো ছুরি দিয়ে বারবার আঁচড় কাটছে, আর আমি উত্তর খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো আমি যখনই এমন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক অসহায়তার মধ্যে পড়ি, যখন আমার চিন্তার স্রোতে ছেদ পড়ে , যখন আমার মুক্তচিন্তার মানসিক পাখিটা অদৃশ্য খাঁচায় আটকা পড়ে যায় তখনই আমার বন্ধু সাজিদ কেমন করে যেন আমার সামনে এসে হাজির হয়।

সাজিদ—যাকে আমি কোনো সাধারণ অর্থে কেবল ‘বন্ধু’ বলতে চাই না। সে যেন আমার কৌতূহলী মন

INTERNET ARCHIVE

আর অস্থিরতার মাঝে থাকা এক অদৃশ্য সেতু। আমি যখন বুদ্ধির ঘোরে আটকে যাই, তখন হয় আমি তাকে খুঁজে পাই, নয়তো সে নিজেই কোনোভাবে আমাকে খুঁজে নেয়। মনে হয়, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দেহ-মন দিয়ে নয়, বরং চিন্তার গভীরতা দিয়ে তৈরি। ধুলোপড়া আয়না যত্ন করে মুছলে যেমন ঝাপসা মুখচ্ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে , সাজিদ কে দেখলে আমার নিজেরই সেই আলোকিত alter ego বা দ্বিতীয় স্বত্ত্বার কথা মনে হয় । আমি যখন নিজের প্রশ্নগুলো নিয়ে প্রায় ডুবে যাচ্ছি, তখন বুঝলাম সাজিদ নিঃশব্দে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন সে আমার মনের অস্থিরতার শব্দ শুনে এসেছে।

সে শান্ত কণ্ঠে বলল, “বন্ধু আবার সেই একই চিন্তার চোরাবালিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছো, তাই না?”

আমি মাথা তুললাম। আমার চোখে ঠিক সেই অস্থিরতা ছিল, যা কোনো শব্দে বাঁধা যায় না।

আমি ধীরে বললাম, “হ্যাঁ সাজিদ... বারবার মনে হয়,

যদি মহাবিশ্বের একটা শেষ থাকে, আমি সেখানে পৌঁছাতে চাই। আর যদি শেষ না থাকে, তবে অনন্ত কোনো কিছুকে ‘অস্তিত্ব’ বলা কি সত্যিই যায়? আমার চলা কি কোনো অর্থ রাখে? যদি আমি এক সোজা পথে হাঁটতে হাঁটতে কোনো একদিন সত্যিই শেষপ্রান্তে দাঁড়াই —তাহলে কি সেই শেষের বাইরেও আবার একই প্রশ্ন মাথা তুলবে না?”

সাজিদ আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন এই অস্থিরতা শুধুই আমার নয়—মানুষের জন্মগত ভার।

“চলো,” সে বলল,

“আজ তোমার এই প্রশ্নটাকে আমরা একটু অন্য আলোয় দেখি।”

INTERNET ARCHIVE

পর্ব : ২

....

সাজিদ সামনে বসে আছে। চারপাশের পরিবেশটা যেন একটু ভিন্ন হয়ে গেছে— দেয়ালের রং, জানালার আলো, বাতাসের নড়াচড়া— সবই যেন গভীর কোনো নীরবতার ভিতর আত্মগোপন করেছে । আমি অনুভব করলাম, আমার প্রশ্নটি শুধু কথার মধ্যে ছিল না, বরং আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্বটাকেই ধারণ করে ছিল। সাজিদ ধীরে হাত উঁচু করে জানালার দিকে ইশারা করল। বাইরে আকাশে কিছু

INTERNET ARCHIVE

তারার আলো জ্বলছিল। সে বলল, “তুমি কি ভাবো, ঐ আকাশ একটা দেয়াল, আর তারা গুলো আকাশের দেয়ালে গেঁথে আছে? নাকি তুমি শুধু ঐটুকুই দেখতে পাও— কারণ তোমার চোখের সীমানা ঐটুকু পর্যন্তই পৌঁছায়?”

আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে তাকালাম। সে আবার বলল— “মানুষ সবসময় ভাবে— যা দেখা যায়, সেটাই ‘দৃশ্যের’ শেষ সীমা। আর যেখানে চোখ থেমে যায়, সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে চায়— “এর পরেও কি কিছু আছে?” তার কণ্ঠ স্বাভাবিক, তবুও অদ্ভুতভাবে গভীর। আমি তার প্রতিটা শব্দ ধরতে চেষ্টা করলাম। “আমি যদি তোমাকে বলি,” সে বলল, “মহাবিশ্বের শেষ নেই? তুমি যদি সোজা হাঁটো, তোমার যাত্রার কোনো দেয়াল পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেটা এই কারণে নয় যে মহাবিশ্ব ‘অসীম’। বরং তুমি ‘শেষ’ বলতে যা বোঝো, মহাবিশ্ব তা মোটেও বোঝে না।” আমি ধীরে বললাম, “শেষ...

বোঝে না মানে?”

সাজিদ চেয়ারের হাতল ছুঁয়ে আলতো করে বলল– “এই যে তুমি এখনো ধরে নিয়েছ, মহাবিশ্ব মানে একটা বড় ঘর, যার একটা দরজা বা দেয়াল থাকবে– এই ধারণাটাই ভুল। মহাবিশ্ব কোনো জায়গার ভিতরে নেই, বরং মহাবিশ্ব নিজেই সেই ‘জায়গা’ যার মধ্যে সবকিছু রয়েছে ।” আমি কথাটা পুরোপুরি ধরতে পারলাম না। কিছুটা বুঝলাম, আবার অনেকটা অন্ধকারেই রইল। সে আমাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল, যেন বুঝছিল আমার বোঝার সীমারেখা কোথায়। তারপর বলল– “ভাবো, তুমি একটি নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি যদি জিজ্ঞেস করো– ‘নদীর ভেতর কোথায় নদীর শেষ?’ তাহলে উত্তর কী হবে?” আমি বললাম, “নদী বলতে তো সেই প্রবাহ–পানি, গতিমুখ, দুই তীর... শেষ মানে তো নদীর চরিত্রই শেষ হয়ে যাওয়া।” সাজিদ হাসল। তার হাসিটা শান্ত, উষ্ণ।

INTERNET ARCHIVE

“ঠিক তাই,” সে বলল, “জায়গা, দিক, দূরত্ব— এইসব ধারণা মহাবিশ্বের মধ্যে জন্মায়। মহাবিশ্ব নিজে এই ধারণাগুলোর মতো কোনো জিনিস নয় যাকে বাইরে দাঁড়িয়ে মাপা যাবে।”

তারপর সে একটু সামনে ঝুঁকে বলল— “তুমি যে প্রশ্ন করছ— ‘আমি সামনে হাঁটলে শেষ পাবো কি?’ এই প্রশ্নের ভিতরেই লুকিয়ে আছে এই ভ্রান্ত ধারণা যে তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে মহাবিশ্বকে ‘অতিক্রম’ করতে পারবে।” সে মাথা নাড়ল। “কিন্তু তুমি মহাবিশ্বের বাইরে দাঁড়াতে পারো না। তুমি, তোমার পথ, তোমার হাঁটা— সবই তো এরই ভিতর। তাহলে কিভাবে তুমি এমন এক জায়গায় পৌঁছাবে যা মহাবিশ্বের বাইরে থাকতে পারে?” কথাগুলো আমাকে যেন ভেতর থেকে কোনো আলতো ঝাঁকুনি দিল। এ যেন প্রশ্নের উত্তর নয়— বরং প্রশ্নই বদলে গেল। সাজিদ পিছনে হেলান দিয়ে বলল— “শেষ খুঁজতে গিয়ে তুমি আসলে এমন কিছু খুঁজছ যা তোমার নিজেরই সীমানা। মহাবিশ্বের নয়।” তার

INTERNET ARCHIVE

সেই শেষ বাক্যটি আমার মাথায় স্থির হয়ে রইল— ভারি কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক আলোর খুঁটির মতো। আমি বুঝলাম— আমার যাত্রা শুধু শুরু হয়েছে।

INTERNET ARCHIVE

পর্ব : ৩

....

সাজিদের কথার আবেশ ঘরের বাতাসে ভেসে রইল। আমি চুপচাপ বসে ছিলাম, যেন কেউ আমার বুকের গভীর কোথাও হাত দিয়ে ধীরে ধীরে একটি গিঁট খুলে দিচ্ছে— কিন্তু সেই গিঁট খুলতে গিয়ে আরো বহু গিঁট বেরিয়ে আসছে। আমি বললাম, “তুমি বলতে চাও... আমার প্রশ্নটাই ভুল?” সাজিদ মাথা নাড়িয়ে বলল, “না, প্রশ্ন ভুল নয়। কিন্তু প্রশ্নের

INTERNET ARCHIVE

দৃষ্টিভঙ্গী ভুল। মানুষের মন সবসময় এমনভাবে তৈরি— যে সে নিজের দাঁড়ানোর জায়গাটাকে সৃষ্টির কেন্দ্র মনে করে। সেখান থেকে তাকিয়ে যা দেখা যায়, তাই নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে। তাই প্রশ্নগুলোও হয় মানুষের মতো— সীমিত দৃষ্টির ভিতর থেকে জন্মানো।” সে একটু থামল, আমার চোখের দিকে তাকাল, তারপর বলল— “তুমি শেষ খুঁজছ। কিন্তু তুমি ভাবছ না, শেষ যদি থেকেও থাকে, তা কি তোমার পথের শেষ, নাকি তোমার ধারণার শেষ?” আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করলাম, কারণ এই প্রশ্নটা যেন আমার ভেতরেই জন্মেছিল যা আমি নিজেই দেখতে পাইনি। আমি বললাম, “আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন করছি— আমি সোজা হাঁটলে কি কোনোদিন থামার জায়গা পাওয়া যাবে?” সাজিদ ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। তার গলায় কথা নয়— একটা নরম ভার অনুভূত হলো। “শোনো,” সে বলল, “একটা শিশু

INTERNET ARCHIVE

যখন পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম দেখে, সে ভাবে সমুদ্রের শেষ আছে। মানচিত্র যেখানে শেষ— ওখানেই পৃথিবী শেষ। কিন্তু সে জানে না, মানচিত্র আসলে তার দেখার সীমা, পৃথিবীর সীমা নয়।” আমি ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করলাম সে কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।

সাজিদ আবার বলল— “তুমি মহাবিশ্বকে কল্পনা করছ একটা বিশাল মানচিত্রের মতো... যার প্রান্ত আছে। আর তুমি সেই প্রান্তে গিয়ে দেয়ালে হাত রেখে বলবে, ‘এখানেই শেষ।’ কিন্তু মহাবিশ্ব মানচিত্র না— বরং সেই ‘দেখা’ আর ‘কল্পনা’ করার ক্ষমতারও বাইরে।” আমি নিশ্বাস নিলাম একটু গভীরভাবে। “তাহলে আমি কি কিছুই জানতে পারব না?” আমার কণ্ঠে হতাশা ছিল, যা আমি লুকাতে পারিনি। সাজিদ ফিরে এসে আবার বসে বলল— “জানতে পারবে। কিন্তু জানাটা হবে ভিন্নভাবে। তুমি শেষ খুঁজছ— কারণ তোমার ভেতরে একটা

অনুভূতি আছে যা সীমারেখা খুঁজে নিরাপদ হতে চায়। মহাবিশ্বের শেষ পেলে তুমি ভাবছ এক ধরনের নিশ্চয়তা আসবে– 'আচ্ছা, এর বাইরে আর কিছু নেই।'" সে আমার দিকে ঝুঁকে ধীরে বলল– "কিন্তু মানুষ যতদিন 'শেষ' খুঁজবে, ততদিন মহাবিশ্ব তাকে আরো গভীরে নিয়ে যাবে। কারণ শেষ খুঁজতে গিয়ে মানুষ যে জিনিসটি আসলে খুঁজে পায়... তা হলো নিজের ভেতরের ভয়, একাকীত্ব, আর অসীমকে বোঝার তৃষ্ণা।"

আমি একটু কেঁপে উঠলাম। সত্যিই কি তাই? আমি কি মহাবিশ্বের শেষ নয়, নিজের ভেতরের ভয়গুলো খুঁজছি? আমি কি নিজের ভেতরের শেষ বিন্দুই খুঁজছি? মহাবিশ্বের অসীমকে ছুতে গিয়ে আমি কি একান্ত নগ্নভাবে নিজের সীমাবদ্ধতারই মুখোমুখি হলাম ? আমার চিন্তার স্রোতে ছেদ টেনে সাজিদ বলে উঠল– "তোমার প্রশ্ন মহাবিশ্বকে নিয়ে– কিন্তু তার উত্তর তোমাকে নিয়েই।" তার কথার পর

পরিবেশটা যেন আরও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দেয়াল, বাতাস, মৃদু আলো-আধারি — সবকিছুই যেন শুনছিল নীরবে। আমি বুঝলাম— সাজিদ শুধু মহাবিশ্ব ব্যাখ্যা করছে না। সে আমাকে আমারই ভিতরে ফিরিয়ে নিচ্ছে। আর আমি জানতাম— এর পরের উত্তরগুলো আরো গভীর হবে, আরো সত্য হবে। আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যাত্রার দিক ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে ঘুরছে।

পর্ব : ৪

....

সাজিদের শেষ কথাটা আমার চেতনার গহীনে এক অমীমাংশিত প্রশ্নোত্তর হয়ে ঝুলে রইল। আমি কিছু বলতে পারছিলাম না। এমন নয় যে উত্তর শুনে ভয় পেয়ে গেছি— বরং মনে হচ্ছিল কেউ হঠাৎ আমার চোখে একটা নতুন জানালা খুলে দিয়েছে, আর সেই জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্য আমি আগে কখনো

INTERNET ARCHIVE

ভাবিনি। আমি বললাম, "তাহলে এখন আমি কী জানতে চাই? আমি যদি ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করেও থাকি... তবুও তো মহাবিশ্ব কোনো এক রকম— তার কি সত্যিই কোনো শেষ নেই?" সাজিদ মাথা নিচু করে একটু ভেবে বলল— "শেষ আছে কি নেই— এই প্রশ্নটাই এমনভাবে করা যেন তুমি নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছ, নদীর শেষ সীমানা কোথায় ? এই ঢেউরাশির শেষ গন্তব্য কত দূর ?" আমি ভ্রু কুঁচকে বললাম, "কিন্তু নদী তো শেষ হয়। একসময় গিয়ে সমুদ্রে মিশে যায়।" সাজিদ হাল্কা হাসল। তার হাসিটা প্রশান্ত— যেন বহুবার একই ভুল মানুষ করে আর সে ধৈর্য ধরে তা বোঝায়। "নদীর শেষ বলতে যা বুঝো," সে বলল, "সেটা আসলে নদীর সীমান্ত নয়— বরং তার রূপ বদলানো। নদী শেষ হয়নি— শুধু তার নতুন নাম হয়েছে 'সমুদ্র'। পানিতে পানির কোন সীমারেখা টানা যায়না, শুধু নামের রূপান্তর হয়। একটা

বায়ুপূর্ণ বেলুনকে সূচ দিয়ে ছিদ্র কর, দেখবে বেলুনের ভিতরের বাতাস বাইরের বিশাল অসীম বায়ুরাশির সাথে কেমন একাকার হয়ে গেছে। তুমি দুয়ের ভিতরে কোন সীমারেখা টানতে পারবে কি?”

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এমন করে কখনো ভাবিনি। হঠাৎ মনে হলো– যদি নদীর শেষ শুধু নামের বদল, তাহলে মহাবিশ্বের শেষও কি শুধু ধারণার বদল? আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তাহলে যদি আমি সরলরেখায় হাঁটি, নিরন্তর, তাহলে আমি কি মহাবিশ্বের রূপান্তরের জায়গায় পৌঁছাবো? যেখানে আমার ‘দেখা’ বদলে যাবে?” সাজিদ এবার একটু সোজা হয়ে বসল। তার চোখে একটা আলাদা দৃঢ়তা ছিল। “হ্যাঁ,” সে বলল, “তুমি হয়তো এমন এক অবস্থায় পৌঁছাবে যেখানে তোমার বোধ বদলে যাবে। তুমি বুঝবে যে ‘শেষ’ বলে তুমি যা ভাবছ, তা আসলে শেষ নয়– বরং তোমার বোঝার সীমারেখা।” তারপর সে ধীরে বলল– “শেষ এমন

INTERNET ARCHIVE

কিছু নয় যা মহাবিশ্বের বাইরে দাঁড়িয়ে পাওয়া যায়। শেষ এমন কিছু যা কেবল মানুষের মনে থাকে। কারণ আমরা সীমিত সময় নিয়ে বাঁচি, সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে চলি, সীমিত চোখ দিয়ে দেখি। তাই আমরা সর্বদাই সীমার ধারণায় বিশ্বাস করি।” তার কণ্ঠ খুব শান্ত ছিল, কিন্তু সেই শান্তির নিচে অদ্ভুত এক গভীরতা লুকানো। “কিন্তু মহাবিশ্ব,” সে বলল, “সীমার ধারণায় চলে না। তাই তুমি সোজা হাঁটতে হাঁটতে যেখানে পৌঁছাবে— সেটা শেষ নয়, বরং তোমার নিজের ‘জানার সীমানা’। আর সেই সীমানা পেরোলেই সবকিছু বদলে যাবে।” আমি ধীরে ধীরে বললাম, “বদলে যাবে... কীভাবে?” সাজিদ খুব নরম স্বরে বলল— “যেভাবে অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আলো পেয়ে গেলে তোমার চোখ, তোমার চেতনা নতুন করে জিনিস চিনতে পারে। ঠিক তেমনই— মহাবিশ্বের শেষ খুঁজতে গিয়ে তুমি কোনো দেয়ালে আটকে যাবে না। বরং তুমি এমন জায়গায় যাবে যেখানে তোমার উপলব্ধির দরজা খুলে যাবে।

আর তুমি বুঝবে— শেষ বলে কিছু ছিল না, থাকবেও না।”

তার এই কথাগুলো শুনে আমার শরীরে একটা অদ্ভুত শিহরণ উঠল। এ যেন এক অদৃশ্য সত্যের স্পর্শ— যা দীর্ঘদিন ধরে আমার প্রশ্নকে নীরব মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। আমি বুঝলাম— আমার প্রশ্নের উত্তর আমাকে ধীরে ধীরে আমার মন, আমার সীমাবদ্ধতা, আর আমার ধারণাকে নতুনভাবে দেখতে বাধ্য করছে। আর তখনই সাজিদ একটু ঝুঁকে বলল— “মহাবিশ্বের শেষ খুঁজতে চেয়ো না। কারণ শেষ নেই। কিন্তু এই যাত্রা— যা তুমি শুরু করেছ— তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যা শেষের থেকেও বেশি গভীর।” আমি জানতাম— এরপর যা আসবে, তা আমার ভেতরের সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসাটাকে নতুন আকৃতি দেবে।

পর্ব : ৫

....

সাজিদের চোখে তখন আর কোনো যুক্তির তাগিদ ছিল না। তার মুখে ছিল অন্যরকম স্থিরতা— এক ধরনের নীরব আলো, যেন সে আর আমার প্রশ্নের উত্তরের দিকে নয়, এক অদৃশ্য কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ধীরে বললাম, "তাহলে... এই অসীম পথ, এই সীমাহীনতা— সবকিছুর অর্থ কি

শুধু এটুকুই যে আমরা কখনোই শেষ জানতে পারব না?” সাজিদ মাথা নাড়ল। তার কণ্ঠের স্বর নরম হয়ে গেল, কিন্তু সেই কোমলতার মধ্যেই ছিল অতল গভীরতা। “না,” সে বলল, “শেষ না পাওয়ার ভেতরেই একটি বাস্তবতা লুকানো আছে। তুমি যত দূরেই হাঁটো, যত দূরের তারার কাছে যাত্রা করো— সেই অসীমতার অনুভূতি তোমাকে একদিন নিশ্চিত করে দেবে এই সত্যটি— মানুষ ছোট। অতি ছোট।" আমি অনুভব করলাম— আমার ভেতরে যেন কিছু মোমের মত গলে যাচ্ছে, যেন বহুদিনের একটি কাঠিন্য ধীরে ধীরে নরম হয়ে পড়ছে। সাজিদ বলল— “তুমি যে প্রশ্ন করছ ‘শেষ কি আছে?’— এর গভীরে আছে মানুষের অসহায়ত্বকে না মানার প্রবণতা। মানুষ ভাবতে চায়— সে সব জানবে, সব মেপে নেবে, সব শেষ বুঝে নেবে। কিন্তু মহাবিশ্ব সেই ইচ্ছাকে আলতোভাবে ভেঙে দেয়।” সে জানালার দিকে তাকাল— যেখানে রাতের আকাশ জ্বলছিল কোটিকোটি দূরের আলোয়। “আকাশের এই

INTERNET ARCHIVE

অসীমতা,” সে বলল, “তোমাকে অবরুদ্ধ করার জন্য নয়। তোমাকে নত করার জন্য।”

এক মুহূর্তে আমার ভেতর গভীর নীরবতা নেমে এল। এ নীরবতা ভয় নয়— কোনো শূন্যতাও নয়। এ ছিল এক ধরনের অচেনা শান্তি, যার উৎস বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু তাকে অস্বীকারও করতে পারছিলাম না। আমি বললাম, “নত করার জন্য... কেন?” সাজিদ আমার দিকে তাকাল, আর তার দৃষ্টিতে ছিল এমন এক কোমল দৃঢ়তা যা কোনো বইয়ের পাতা থেকে আসে না— যা আসে অভিজ্ঞতা, অস্তিত্ব আর সত্যের গভীরতা থেকে। সে বলল— “যাতে তুমি বুঝতে পারো এই বিশালতা কার। এই অসীম পথ কার। এই অপরিমেয় নকশা কার হাতে আঁকা। মহাবিশ্ব তোমাকে কখনো শেষ দেখাবে না— কারণ শেষ দেখালে তুমি ভাবতে তুমি তা ‘বুঝে নিয়েছ’। কিন্তু নিঃশেষের অনুভূতি মানুষকে আরেক জায়গায় ঠেলে দেয়— যেখানে মানুষ নিজের

ক্ষুদ্রতার সামনে দাঁড়ায়, আর সেই ক্ষুদ্রতাই তাকে তার প্রকৃত জায়গায় পৌঁছে দেয়।" আমি অনুভব করলাম আমার বুকের ভেতরের ভার হঠাৎ হালকা হয়ে গেছে— যেন দীর্ঘদিন ধরে আমি একটা ভুল দিকেই দরজা খুলছিলাম, আর আজ প্রথমবার সঠিক দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সাজিদ শান্ত স্বরে বলল— "জেনো, অসীমতার উদ্দেশ্য তোমাকে ভয় দেখানো নয়। বরং জানিয়ে দেওয়া— যে সেই অপরিসীম বিস্ময়ের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কতটা ক্ষুদ্র, সীমিত ও অসম্পূর্ণ । আর এই অসীমতার পেছনে আছেন সেই স্রষ্টা, যাঁর সামনে নত হওয়াই তোমার প্রশ্নের শেষ আর তোমার যাত্রার শুরু।"

আমি চোখ বন্ধ করলাম। মনে হলো— যে প্রশ্ন আমাকে এতদিন তাড়া করছিল তা আর কোনো দেয়াল, প্রান্ত বা সীমা খুঁজছে না। বরং সে এখন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মহা-অসীমের সামনে

INTERNET ARCHIVE

যা মানুষ অতিক্রম করতে পারে না– শুধু অনুভব করতে পারে। আর আমি জানলাম– শেষ খুঁজতে গিয়ে আমি স্রষ্টাকেই খুঁজে পেয়েছি।

সমাপ্ত